KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 01, Issue : 01, (July - December) 2024
Published On 15th September 2024

স্বাধীনতার সাত দশক ও শ্রমজীবীর অধিকার: লড়াই চলছে, চলবে

প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ
সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতা মুক্তির দ্যোতক। আর কে না জানে অধিকার বিনা মুক্তি অলীক কল্পনাসম। খুব বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই, ভারতীয় সংবিধানের পাতা উল্টোলেই দেখতে পাওয়া যায় মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি নাগরিকের হক। অধিকার একটা আন্তর্জাতিক বিষয়ও বটে। কিন্তু রাজনীতি নিয়ে আমরা যতটা ভাবি, অধিকার নিয়ে ভাবনা তেমন একটা চোখে পড়ে না। আমাদের দাবির বিষয়কে আমরা যতটা রাজনীতি দিয়ে ভাবি, ততটা অধিকার দিয়ে ভাবি না। আর যদি সেই অধিকারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তথাকথিত 'প্রান্তিক', ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে থাকা শ্রমজীবী মানুষ– তাহলে তো মৌনতায় প্রচলিত রীতি। স্বাধীনতা সাত দশক পেরিয়েও মেহনতী মানুষের প্রাপ্তির ঝুলি ক্রমশ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন একটু একটু করে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে ন্যায্য পাওনা, অধিকারের পরিধিও ক্রমক্ষীয়মান। পাল্টা সংগ্রামই তাই অধিকার অর্জনের একমাত্র হাতিয়ার। সংখ্যায় কম হলেও, সে দৃষ্টান্তও স্বাধীনোত্তর ভারত দেখেছে ভিন্ন পরিসরে, ভিন্ন আঙ্গিকে। আলোচ্য নিবন্ধে ধরা রইল তেমনই দুই সংঘর্ষ ও নির্মাণের কাহিনী।

সুচকশব্দঃ শ্রমজীবী, শ্রমিক ইউনিয়ন, সরকার, স্বাধীনতা, অধিকার

(১)

জুলাই, ১৯৮৫ ভোপালের এক পড়ন্ত বিকালের ছবি। ছত্তিশগড় তখনও আলাদা রাজ্যের স্বীকৃতি পায়নি। এক টিলার ওপর ভোপাল জেলের পেছনে সূর্য ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে। সেদিন জামিনে মুক্তি পাবেন একদল বন্দী। জেলের সামনে সমবেত হয়েছেন তাদের সঙ্গী-সাথীরা। আধময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক দীর্ঘদেহী পুরুষের স্লোগানে স্লোগান তুলছে অপেক্ষারত জনতা–"জেলকা তালা টুটেগা, হামারা সাথী ছুটেগা"– নেতার মুক্তির আনন্দে স্লোগানের রেওয়াজ কোনও নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু সেই স্লোগান থেকে যখন ঠিকরে বেরোতে থাকে শোষিত, নিষ্পেষিত, শ্রমজীবী মানুষের নতুন লড়াইয়ের স্ফুলিঙ্গ, তখন তা অন্য মাত্রার দাবি রাখে। ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার নেতা শংকর গুহনিয়োগীর নেতৃত্বে মেহনতী মানুষের লড়াই সেই বিরল কীর্তির দলিল।

শঙ্কর তাঁর আসল নাম নয়, তাঁর প্রকৃত নাম ধীরেশ, বাবা হেরম্বকুমার ও মা কল্যাণী। পিতার কর্মসূত্রে আসামে প্রকৃতির কোলে কাটে তাঁর শৈশব। এরপর চলে আসেন আসানসোলের সাঁকতোরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে। সেখানে থেকেই চলতে থাকে মাধ্যমিকের পড়াশোনা। এখানেই ধীরেশ প্রত্যক্ষ করেন খনিশ্রমিকদের জীবন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। অচিরেই উপলব্ধি করেন ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য। বুঝতে শুরু করেন বড়লোকের আরও বড়লোক এবং গরিবের আরও গরিব হওয়ার প্রকৃত রহস্য। জলপাইগুড়িতে আই এস সি পড়ার

সূত্রে ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন, অচিরেই হয়ে ওঠেন ছাত্র ফেডারেশনের একনিষ্ঠ কর্মী। ১৯৫৯ সালে বাংলা যখন খাদ্য আন্দোলনে উত্তাল, সেইসময় কুশলী ছাত্রসংগঠক রূপে অবিভক্ত কমিউনিস্ট দলের সদস্যপদও পান। পেয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সুযোগও। কিন্তু সুপারিশের অনিয়মকে মেনে নিতে না পেরে ঘর ছাড়লেন। সম্বল শুধুমাত্র শ্রমজীবী জনতার মুক্তির স্বপ্ন।

১৯৬১ সালে প্রশিক্ষণের পালা চুকিয়ে ভিলাই ইস্পাত কারখানার কোক ওভেন বিভাগে দক্ষ শ্রমিকের চাকরিতে যোগ দিলেন ধীরেশ। সেইসঙ্গে দুর্গের বিজ্ঞান কলেজে চলতে থাকল উচ্চশিক্ষার পাঠ। ক্রমে এই কলেজের কুশলী ছাত্রনেতা হিসাবে ছড়িয়ে পড়ল ধীরেশের নাম। দুর্গ পুরসভার সাফাইকর্মীদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়ে আদায় করলেন বিভিন্ন দাবিদাওয়া। ভিলাই ইস্পাত কারখানায় এ আই টি ইউ সি-র সঙ্গে থেকেও স্বাধীনভাবে সংগঠিত করতে থাকলেন শ্রমিকদের। ১৯৬৪ তে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে, সি পি আই এম-এর সাথে আসেন ধীরেশ। ১৯৬৭-র নকশালবাড়ির গণঅভ্যুত্থান মধ্যপ্রদেশেও তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, ধীরেশও তা থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি। ১৯৬৯ সি পি আই এম-এল গঠিত হওয়ার পর কিছুদিন তিনি তার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। কিন্তু অচিরেই পার্টি লাইনের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে দল থেকে বহিষ্কৃত হন। ইতিমধ্যে ভিলাই ইস্পাত কারখানার প্রথম সফল ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়ে খোয়াতে হয় চাকরি। অন্যদিকে 'নকশালপন্থী' তকমা লাগিয়ে পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজছে তাঁকে। বাধ্য হয়ে আত্মগোপনের পথ বেছে নেন। তবে থেমে থাকেনি লড়াই। একটি হিন্দি সাপ্তাহিকের মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। লেনিনের 'ইস্ক্রা'র অনুপ্রেরণায় যার নাম রেখেছিলেন 'স্ফুলিঙ্গ'। এইসময়ই তিনি উপলব্ধি করেন শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে শোষিত ছত্তিশগড়ী জাতিসত্তার মেলবন্ধন না ঘটাতে পারলে শ্রমিক আন্দোলন সফল হবে না। শুরু হয় ছত্তিশগড়কে জানার পালা, ছত্তিশগড়ের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার পর্ব। পুলিশের নজর এড়িয়ে কখনও ফেরিওয়ালা, কখনও জেলের ছদ্মবেশে যোগসূত্র অটুট রাখেন সহকর্মীদের সাথে, এর সঙ্গেই তাল মিলিয়ে চলতে থাকে মানুষকে সংগঠিত করার কাজ। ১৯৭১-এ যোগ দিলেন ভিলাই ইস্পাত প্রকল্পের দানীটোলা কোয়ার্জাইট খনিতে এক ঠিকা শ্রমিক হিসাবে, পাথর ভাঙার কাজে। এইসময় থেকেই 'শংকর' ছদ্মনামে তিনি পরিচিত হন। এখানেই পরিচয় ও পরিণয় সহশ্রমিক সিয়ারামের কন্যা আশার সঙ্গে। ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার সময় মিসা আইনে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর তৈরি প্রথম শ্রমিক ইউনিয়ন দানীটোলা সংগঠনের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন শংকর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভিলাই ইস্পাত প্রকল্পের সবচেয়ে বড় খনি ছিল দল্লী-রাজহরায়, দানীটোলা থেকে যার দূরত্ব মাত্র ২২ কিলোমিটার। জরুরি অবস্থাকালে এই দল্লী-রাজহরা উত্তাল হয়ে উঠেছিল ঠিকাদারি খনিশ্রমিকদের আন্দোলনে। অভাব ছিল নেতৃত্বের। শ্রমিকদের অনুরোধে ১৯৭৭-এ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে শংকর তুলে নিলেন সেই নেতৃত্বের ব্যাটন। গঠিত হল ঠিকা খনিশ্রমিকদের স্বাধীন সংগঠন 'ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘ' বা 'সি এম এস এস'। নতুন ইউনিয়নের পতাকার রঙ লাল-সবুজ। লাল শ্রমিকশ্রেণির আত্মবলিদানের রঙ, আর সবুজ কৃষকের। ছত্তিশগড়ের মাটিতে শুরু হল শ্রমজীবীর অধিকার প্রতিষ্ঠার এক নতুন অধ্যায়, যার পথ প্রদর্শক শংকর গুহনিয়োগী।

শংকর গুহনিয়োগী'র নেতৃত্বে খনিশ্রমিকদের প্রথম লড়াই ছিল দালাল নেতাদের চুক্তি বর্জনের বিরুদ্ধে লড়াই আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও ভিলাই ইস্পাত কারখানার শ্রমিকরা দালাল নেতাদের চুক্তি মানতে রাজি হননি। ১৯৭৭ সালের মে মাসে শুরু হয় 'আইডল ওয়েজ' এবং বর্ষার আগে ঘর মেরামতের দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলন। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের চাপে শ্রমআধিকারিকদের উপস্থিতিতে ভিলাই ইস্পাত প্রকল্পের ম্যানেজমেন্ট ও ঠিকাদারেরা শ্রমিকদের দাবি মেনে নেয়। কিন্তু অচিরেই তা অস্বীকার করলে শুরু হয় শ্রমিক ধর্মঘট। গ্রেপ্তার হন নিয়োগী। নেতার মুক্তির দাবিতে শ্রমিকদের ঘেরাও প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পুলিশের গুলিতে নারী শ্রমিক সহ মোট ১১ জন নিহত হন, কিন্তু পুলিশের অত্যাচার শ্রমিক আন্দোলন ভাঙতে পারেনি। ১৮ দিন লম্বা ধর্মঘট চলার পর ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকদের সব দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। জেল থেকে ছাড়া পান নিয়োগী। শ্রমিক অধিকার অর্জনের এই সাফল্য ভিলাই ইস্পাত প্রকল্পের অন্যান্য খনিতে ছড়িয়ে পড়ে। দানীটোলা, নন্দিনী, হিররী'তে গড়ে ওঠে সি এম এস এস-এর শাখা। ক্রমেই

আন্দোলনের ঢেউ প্রসারিত হয় পার্শ্ববর্তী বস্তার জেলাতেও। বস্তারের বাইলাডিলা লৌহখনিকে পুরোপুরি যান্ত্রিকীকরণ করার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদে নিয়োগীর নেতৃত্বে পাশে দাঁড়ায় দল্লী-রাজহরার শ্রমিকরা। অচিরেই দল্লী-রাজহরাতেও যে একই বিপদ আসন্ন নিয়োগী তা শ্রমিকদের মনে করিয়ে দেন। শুরু হয় শ্রমিক স্বার্থরক্ষার দাবিতে যান্ত্রিকীকরণ বিরোধী আন্দোলন। ইউনিয়নের চাপে ম্যানেজমেন্ট বাধ্য হয় 'অর্ধ-যান্ত্রিকীকরণের প্রস্তাব' মেনে নিতে। যার লক্ষ্য ছিল একাধারে উৎপাদনের পরিমান ও গুণগতমান বজায় রাখা এবং শ্রমিক ছাঁটাই রোধ করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রমজীবীদের এই সাফল্য অটুট ছিল ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত।

সি এম এস এস-এর একের পর এক সফল আন্দোলনের ফলে দল্লী-রাজহরার শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়লেও, বদলায়নি জীবনযাত্রার মান। বরং আদিবাসী শ্রমিকরা ক্রমশ মদ্যপানের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েন। নিয়োগীর পক্ষে যা কখনোই মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। শ্রমিকদের মদ্যপানের আসক্তি থেকে বাঁচাতে তাই নিয়োগী শুরু করেন শরাববন্দি আন্দোলন। তাঁর স্পষ্ট যুক্তি ছিল যে, শহীদদের রক্ত মদের ভাটিখানার নালায় বইতে পারে না। নিজে কারাবন্দী হলেও, নিয়োগীর প্রচারেই প্রায় ১ লক্ষেরও বেশি মানুষ মদ্যপানের নেশা থেকে মুক্ত হন। আসলে তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন ও কার্যকলাপেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাননি শংকর গুহনিয়োগী। তাঁর স্বপ্ন ছিল আরও বড়। শ্রমজীবীর জীবনের প্রতিটি দিকই উন্নত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। ট্রেড ইউনিয়ন শুধুমাত্র শ্রমিকের কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত বিষয়েই আটকে থাকতে পারে না বললেই মনে করতেন তিনি। তাই তাঁর দাবি ছিল, ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ট্রেড ইউনিয়নকে হতে হবে শ্রমিকদের ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী। এই ভাবনা থেকেই দল্লী-রাজহরায় নিয়োগীর নেতৃত্বে ইউনিয়ন চালিয়েছিল অভিনব পরীক্ষানিরীক্ষা। শ্রমিক বসতির উন্নতির জন্য গড়ে উঠেছিল মহল্লা কমিটি, শিশু শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বয়স্ক শিক্ষার পাঠশালায় চলত শিক্ষাবিস্তারের কাজ। ইউনিয়নের চাপেই সরকার ও খনি ম্যানেজমেন্ট বাধ্য হয় শহরাঞ্চলে অনেকগুলি স্কুল চালু করতে। বাদ পড়েনি স্বাস্থ্যও। সাফাই আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হয় জনস্বাস্থ্য রক্ষার উদ্যোগও। ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শহীদ হাসপাতাল। শ্রমিকদের অবসর-বিনোদন ও শরীরচর্চার জন্য গড়ে তোলা হয় শহীদ সুদামা ফুটবল ক্লাব, রেড-গ্রিন অ্যাথলেটিক ক্লাব। নারীমুক্তি আন্দোলনের জন্য গঠিত হয় মহিলা মুক্তি মোর্চা। পরিবেশ আন্দোলনেও পথ দেখায় সি এম এস এস। সরকারের জনবিরোধী বননীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গড়ে তোলা হয় মডেল বনসৃজন প্রকল্প।

স্বাধীনোত্তর ভারতে শংকর গুহনিয়োগীর নেতৃত্বে শ্রমজীবীর অধিকার অর্জনের লড়াই ছিল আক্ষরিক অর্থেই এক অভিনব পথের দিশারী। বেতন বৃদ্ধি ও বোনাস আদায়ের গণ্ডিতে যাকে বেঁধে ফেলা যায় না। শ্রমিকদের সামগ্রিক বিকাশই ছিল এর মূল লক্ষ্য। একাধারে 'সংঘর্ষ' ও 'নির্মাণ' ছিল এই যুদ্ধের স্লোগান। ছত্তিশগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ যে এই অভিনব প্রচেষ্টায় সামিল হবেন, তাও কোনও আশ্চর্য বিষয় ছিল না। দুর্গ, বস্তার, রাজনাদগাঁও, রায়পুর, বিলাসপুরের অসংখ্য মানুষ লাল-সবুজ পতাকার তলায় সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল ক্ষমতার লোকেরা, লুটেরা মালিকপক্ষ। শংকর গুহনিয়োগীর নেতৃত্বও তার গ্রাসে পড়ে শীঘ্রই। ১৯৯০-এ শুরু হওয়া ভিলাই শ্রমিক সংগ্রাম ছিল নিয়োগীর নেতৃত্বে লড়া শেষ সংগ্রাম। আপাতদৃষ্টিতে এই আন্দোলনে সামিল শ্রমিকদের দাবিগুলি ছিল খুবই সাধারণ–বেঁচে থাকার মত বেতন, স্থায়ী শিল্পে স্থায়ী চাকরি, ইউনিয়নে সংগঠিত হওয়ার অধিকার। কিন্তু ক্ষমতালিপ্সুদের কাছে এগুলি ছিল অশনিসংকেত। তাই আন্দোলন ভাঙতে জোটবদ্ধ হয় পুলিশ-প্রশাসনসহ সব রাজনৈতিক দল। নিয়োগীকে বন্দী করে রাখা, বিভিন্ন জেলা থেকে বহিষ্কারসহ নানাপ্রকার দমননীতির আশ্রয় নেওয়া সত্ত্বেও দমানো যায়নি আন্দোলনের গতি। শেষপর্যন্ত ১৯৯১'র ২৮ সেপ্টেম্বর গুপ্তঘাতকের গুলিতে স্তব্ধ করে দেওয়া হল নিয়োগীর প্রাণ স্পন্দন। অচিরেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল ছত্তিশগড় মুক্তিমোর্চা। কিন্তু তা বলে যে, শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক অধিকার অর্জনের এই লড়াই যে ব্যর্থ, তা কিন্তু বলা যাবে না। নেতার মৃত্যুতে আদর্শের মৃত্যু হয় না। অবধারিত মৃত্যুর আঁচ পেয়েও অকুতোভয় নিয়োগীর বয়ানেও ফুটে উঠেছে সে কথা–'মৃত্যু তো সবারই হয়, আমারও হবে। আজ, নয় তো কাল।... আমি এ পৃথিবীতে এমন এক ব্যবস্থা স্থাপন করতে চাই যেখানে শোষণ থাকবে না...। আমি এ সুন্দর

পৃথিবীকে ভালোবাসি, তার চেয়েও ভালোবাসি আমার কর্তব্যকে। যে দায়িত্ব আমি কাঁধে নিয়েছি, তাকে সম্পন্ন করতেই হবে।... আমাকে মেরে আন্দোলনকে শেষ করা যাবে না।' যোগ্য নেতার অভাবে, সংগঠনের ভাঙনে, চিন্তার দোদুল্যমানতায় সাময়িক হতাশা আসতেই পারে, কিন্তু শেষপর্যন্ত শহীদদের রক্ত ব্যর্থ হতে পারে না। শংকর গুহনিয়োগী ও তাঁর লড়াই পথ দেখিয়েছে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে। পরবর্তীকালের কানোরিয়ার মহাসংগ্রামের মত শ্রমিক আন্দোলন এই লড়াই থেকেই পেয়েছে প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা।

(২)

শ্রমিক মুক্তি অর্জনে সংঘর্ষ ও নির্মাণের পথে বিকল্প মডেল প্রতিষ্ঠার অধ্যায় থেকে এবার চোখ ফেরানো যাক মর্যাদা আদায়ের সংগ্রামে। স্বাধীনতার সাত দশক পেরিয়েও আমাদের দেশে একদল মানুষ প্রতিনিয়ত লড়ে যাচ্ছেন নিজেদের পেশার সম্মানজনক স্বীকৃতি আদায়ের স্বার্থে, গতর খাটিয়ে পরিশ্রম করেও 'শ্রমজীবী'– এই তকমা আদায় করাই তাদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জকে স্বীকার করেই দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে কাজের মর্যাদার দাবিতে লড়াই করে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের যৌনকর্মীরা আর সেই লড়াইয়ে সেনাপতির ভূমিকা নিয়েছিলেন ডা. স্মরজিৎ জানা।

বর্তমান ভারতের কাজের বাজারের দিকে তাকালেই বোঝা যায় ৯২ শতাংশেরও বেশি মানুষ বিভিন্ন অসংগঠিত পেশায় কর্মরত। যাদের না আছে কোনও নির্দিষ্ট মজুরি, না আছে ধরাবাঁধা কাজের সময়। সামাজিক সুরক্ষার বর্ম পরানোর অজুহাতে অনেক সময়ই গুলিয়ে দেওয়া হয় তাদের শ্রমিক পরিচিতিকেই। যৌনকর্মীদের লড়াইয়ের শুরুটা ঠিক এখান থেকেই। পশ্চিমবঙ্গে এই লড়াইয়ের উৎস সন্ধানে ফিরে যেতে হবে আশি-নব্বইয়ের দশকে। এইডস মহামারি সমাজে তখন আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। ভারত ছিল এইডস ও এসটিডি (সেক্সচুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজেস) আক্রান্তের দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ। রোগটা ছড়াচ্ছিল মূলত যৌনকর্মীদের যৌনরস ও রক্ত থেকে, তাঁদের থেকে অন্যেরা আক্রান্ত হচ্ছিলেন, আবার অন্যের থেকে তাঁরাও আক্রান্ত হচ্ছিলেন। এই রোগকে বাগে আনতে ১৯৯২ সালে 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ'-এর তরফে 'এসটিডি/এইচআইভি ইন্টারভেনশন প্রজেক্ট' গ্রহণ করা হল। এশিয়ার বৃহত্তম যৌনপল্লী সোনাগাছিতে শুরু হল 'সোনাগাছি প্রজেক্ট'। ডিরেক্টর রূপে যার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন ডা. স্মরজিৎ জানা। শুরু হল এক অন্য লড়াই।

যৌনকর্মীদের মধ্যে কাজ করার দৃষ্টান্ত একেবারে নতুন একথা বলা ঠিক হবে না। পৃথিবীর তাবড় তাবড় বিজ্ঞানী যাঁরা যৌনকর্মীদের মাঝে কাজ করতেন তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রচারের মাধ্যমে যৌনকর্মীদের সচেতনতা বাড়িয়ে আর প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থাৎ কন্ডোম ব্যবহার করে বিভিন্ন যৌনরোগ থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। ইতিমধ্যে আমাদের দেশেও যৌনকর্মীদের নিয়ে তৈরি হয় তথ্যচিত্র 'রক্তের অসুখ'। আকাশবাণীর এশিয়ান কান্ট্রি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে 'সোনাগাছি প্রজেক্ট'-এর কাজ সম্প্রচারিতও হয়। কিন্তু এশিয়ার বৃহত্তম যৌনপল্লী সোনাগাছিতে কাজ করতে এসে ডা. জানা উপলব্ধি করলেন, মেয়েদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ তাঁদের হাতে নেই। কারণ খদ্দেররা কন্ডোম ব্যাবহার করতে চান না। অধিকাংশ খদ্দেরই যদি কন্ডোম ব্যবহার করেন আর মাত্র কয়েকজন না করেন তাহলেও সমস্যা মিটবে না, সবাইকেই তা করতে হবে। যৌনকর্মীদের কালেক্টিভ বার্গেইনিং পাওয়ার না বাড়াতে পারলে এইডস বা সিফিলিস, গনোরিয়ার মত এসটিডি (সেক্সচুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজেস) কমানো যাবে না। সুতরাং, যৌথভাবে যৌন পেশায় থাকা মেয়েদের বিপুল ক্ষমতায়ন ঘটিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে পারলেই একমাত্র তা সম্ভব হবে। অর্থাৎ, শুধু স্বাস্থ্যের দিকটা দেখলেই চলবে না। যৌনকর্মীদের অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটাতে হবে। ভাবনার বাস্তব রূপায়ণ মোটেই সহজ কাজ ছিল না। মনে রাখতে হবে সময়ের নিরিখে এই ভাবনা যেমন ছিল বৈপ্লবিক, তেমনই বাস্তব পরিস্থিতও ছিল অত্যন্ত কঠিন। কে না জানে, দারিদ্র ছাড়াও নিপীড়ন যৌনকর্মীদের নিত্যসঙ্গী। পল্লীতে যুগ যুগ ধরে চলা হিংস্রতা, বাড়িওয়ালি, সুদখোর, দালালদের জোড়জুলুম, মাস্তানদের তোলা আদায়ে যৌনকর্মীরা

সবসময় ভয়ে থাকেন। সেই চক্র ভাঙতে না পারলে কন্ডোম ব্যবহার বাধ্যতামূলক হবে না। যৌনকর্মীদের তরফে বাইরে থেকে সিদ্ধান্ত না নিয়ে সেখানে কমিউনিটির যোগদানের প্রস্তাব এসেছিল। ব্যাপারটা খুবই কঠিন ছিল। তাঁদের নিয়ে, তাঁদের সঙ্গে, তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে কাজ করাটা যে কোনও মানুষের কাছেই ছিল অভাবনীয়। এই প্রেক্ষপটেই দরকার ছিল তাঁদের সংগঠন এবং লড়াই। ডা. জানা ও সহকর্মীরা পথ দেখালেন। ১৯৯৫ সালে গড়ে উঠল যৌনকর্মীদের সংগঠন'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি' (ডিএমএসসি)। এইভাবে একসময় যা ছিল রোগ মুক্তির কর্মসূচি, তা ধীরে ধীরে হয়ে দাঁড়াল যৌনকর্মীদের অধিকার আন্দোলন, তাঁদের মর্যাদা আদায়ের সংগ্রাম। স্লোগান উঠল, 'নো কন্ডোম নো সেক্স'।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দুর্বার নামের প্রতি সুবিচার করে যৌনকর্মীদের অপ্রতিরোধ্য লড়াইতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. জানার নির্দেশিত পথে দুর্বারের প্রচেষ্টায় শুধু এইডসই নয়, এসটিডিও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে 'সোনাগাছি প্রোজেক্ট'-এর সুনাম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, পৃথিবীর জনপ্রিয় মডেল হয়ে ওঠে। বর্তমানে দুর্বার, পশ্চিমবঙ্গের পঁয়ষট্টি হাজার মহিলা, পুরুষ ও ট্রান্সজেন্ডারের সংগঠন, যারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ছাড়াও মহিলা ও শিশু পাচার রোধের কাজ করে চলেছে। তবে নিঃসন্দেহে ডা. জানার নেতৃত্বে, দুর্বারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব অসম্মানজনক সম্বোধনের পরিবর্তে, যৌনপেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের প্রতি সমাজের সম্ভ্রম আদায়। 'বেশ্যা'র পরিবর্তে 'যৌনকর্মী' শব্দবন্ধের প্রয়োগে আজ আমরা দ্বিধাবোধ করি না। অর্থের বিনিময়ে যারা যৌনকর্ম করেন, তাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতির দাবিতে ডা. জানা প্রথম থেকেই সোচ্চার হয়েছে। এই বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট অভিমত ছিল আর পাঁচটা পরিষেবা ক্ষেত্রের মতোই যৌনকর্মীদেরও পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবেই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। তিনি দৃঢ়তার সাথে লিখেছেন, 'যৌন পরিষেবার ক্ষেত্রে একজন যৌনকর্মী তাঁর শরীর, মন, বুদ্ধি ও শারীরিক সাহচর্য দিয়ে যে পরিষেবা দেন সেটা কাজ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।' বরং আরও একধাপ এগিয়ে ডা. জানা মনে করতেন স্বাধীন পেশা হিসেবে যৌনকর্মীদের স্বীকৃতি পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক সবল প্রতিবাদ এবং আগামী নারী আন্দোলনের দিশারী। এই ভাবনা থেকেই যখন শহরের রাজপথে দুর্বারের সদস্যরা স্লোগান তুলেছিলেন 'গতর খাটিয়ে খাই/ শ্রমিকের অধিকার চাই', কেঁপে উঠেছিল সমগ্র দেশ। এও তো এক বিকল্প নির্মাণ। নয় কি ?

যৌনকর্মীদের অধিকার অর্জনের পথে ডা. জানা'র আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল সমবায়ের উদ্যোগ– 'ঊষা'। যৌনকর্মীদের রোজগার যেন সুরক্ষিত থাকে এবং তাঁরা যেন প্রয়োজনের সময় ঋণ নিতে পারেন সেই ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগ শুরু হয়। পথটা অবশ্য মসৃণ ছিল না। যৌনকর্মীদের জন্য কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক থাকতে পারে কি না তা নিয়ে বিধানসভায় বিতর্ক ওঠে। এ কাজে ডা. জানার অদম্য মানসিকতার জন্য শেষ পর্যন্ত এই সংক্রান্ত পুরনো আইনের প্রয়োজনীয় রদবদল করতে হয়। অবশেষে ১৯৯৫ সালের জুন মাসে তেরোজন সদস্য ও তিরিশ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে যৌনকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত 'ঊষা মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড' চালু হয়, পৃথিবীতে যৌনকর্মীদের প্রথম কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক। প্রথম প্রথম প্রতিদিন সকালে যৌনকর্মীর ঘরে গিয়ে আগের রাতের রোজগারের টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে আসা হত। এখানে জমানো টাকা সুদ সহ সুরক্ষিত থাকে। সবচেয়ে বড় কথা হল এক সময় যারা ২০০ থেকে ৩০০ শতাংশ সুদে যৌনপল্লীর সুদের কারবারিদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দেনার দায়ে জেরবার হতেন এরপর থেকে তাঁরা ব্যাঙ্কের মতো অতি অল্প সুদে ঊষা কোঅপারেটিভ থেকে ধার নিয়ে পরিবারের নানা প্রয়োজন মেটাতে শুরু করেন। ঊষা কোঅপারেটিভ তাঁদের জীবনে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। বাড়ি করতে, ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে যৌনকর্মীরা এখান থেকে কম সুদে ঋণ নিতে শুরু করেন। নিজেদের সংগঠিত হওয়ার সুবিধা টের পেয়েছিলেন অচিরেই। দু'বছরের মধ্যে ঊষার সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল তিরিশ হাজার। বর্তমানে অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষজনও এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে পারেন। এশিয়ার সর্ববৃহৎ এই কো-অপারেটিভ বর্তমান সরকার এবং পূর্বতন সরকারের কাছ থেকে পুরস্কারও লাভ করেছে।

স্বাধীনতার সাতদশক পেরিয়ে বলতেই হচ্ছে, ডা. জানা'র পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রমজীবীর অধিকার ও মর্যাদা আদায়ে দুর্বার একটা আন্দোলনের অভিমুখ হয়ে উঠেছে, যে আন্দোলন আস্তে আস্তে জড়িয়ে নিয়েছে অসংখ্য প্রান্তিক মানুষকে। আমলাশোলের শবর-আদিবাসী অথবা পুরুলিয়ার নাচনি শিল্পীদের কীভাবে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে হয়, কীভাবে সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্য সম্মান ছিনিয়ে নিতে হয় এসবই তাদের পাশে থেকে, তাদের সংগঠিত করে শিখিয়েছে দুর্বার। বাদ পড়েনি উত্তর প্রজন্মও। যৌনকর্মীদের সংগঠন হওয়ার পর পর অনেকগুলি সংগঠন তৈরি হয় দুর্বারের ছত্রছায়ায়। যৌনকর্মীদের সন্তানরা তৈরি করেন তাঁদের নিজস্ব সংগঠন— 'আমরা পদাতিক'। মায়েদের পেশাকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে দেখা, মাকে শ্রমিকের সম্মান দেওয়া, নাবালক বা নাবালিকাদের অন্য কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়া বন্ধ করা, ড্রপআউট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনা, সর্বোপরি সর্বনাশা ড্রাগের নেশা বন্ধ করা— এই সংগঠনের মূল কাজ হয়ে ওঠে। দুর্বারের কাজকর্মকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে ও যৌনকর্মী বা তাঁদের সন্তানকে সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে ডা. জানা তৈরি করেছেন 'কোমলগান্ধার'। অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সন্তান ও যৌনকর্মীদের সন্তানদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন দুর্বার স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। 'ইমমরাল ট্রাফিকিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট' (ITPA) যার বেশ কিছু ধারা যৌনকর্মী জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা ওপর আঘাত হানে, সেই ধারাগুলি পাল্টানোর জন্য দুর্বার এখনও নিরন্তর আন্দোলন করে চলেছে।

তবে বিতর্কও যে একেবারে হয়নি, তা নয়। যৌনপেশাকে আইনি স্বীকৃতি না দেওয়ার পক্ষেও সওয়াল করেছে বিভিন্ন নারী ও স্বেচ্ছসেবী সংগঠন। এ বিষয়ে তাদের যুক্তি হল, কোনও মেয়েই স্বেচ্ছায় এই কাজে আসেন না, দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁদের বাধ্য করা হয়। শ্রমজীবীর স্বীকৃতি মিললে বাড়বে নাবালিকা বিয়ে ও পাচারের ঘটনা। সম্প্রতি কোভিড অতিমারির আবহেও এই বিতর্ক আবার উঠে আসে। করোনা আবহে আর্থিক সঙ্কটে থাকা যৌন পেশায় যুক্ত মহিলাদের সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষা দিতে যৌনকর্মীদের অসংগঠিত শ্রমিকের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য পরামর্শ-বিধি (অ্যাডভাইজ়রি) প্রকাশ করেছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির একাংশের আপত্তি থাকায় সেই পরামর্শ-বিধি সংশোধন করে ফের প্রকাশ করতে বাধ্য হয় কমিশন।

সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন ডা. জানা। কিন্তু বিতর্ক আছে, বিতর্ক থাকবে। একইসঙ্গে অনন্য হয়ে থাকবে ডা. স্মরজিৎ জানা ও দুর্বারের অদম্য লড়াই। অনন্য এই অর্থেই যে, এই আন্দোলন শুধুমাত্র পিতৃতন্ত্রের প্রতিবাদ করে যৌনসম্পর্কে 'না' বলার লড়াই ছিল না, এই লড়াই মেয়েদের যৌনতায় 'হ্যাঁ বলার অধিকার'-এর আন্দোলন। যা সমাজের গোড়া ধরে টান মারার সাহস দেখিয়েছে। যৌনকর্মের অধিকারকে শ্রমিকের অধিকার বলে স্বীকৃতি দাবি করে মৌচাকে ঢিল মেরেছে যৌনকর্মীদের আন্দোলন। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভূমিকাকে কেবল যৌনকর্মীদেরই নয়, বৃহত্তর অর্থে নারীর, শ্রমিকের ও সমাজমুক্তির অধিকার-বিরোধী বলে চিহ্নিত করেছে। গান গেয়েছে: "রাস্তার মেয়েরাই পথ দেখাচ্ছে/ সূর্যের দিকে আজ দু'হাত বাড়াচ্ছে।"

চুয়াত্তর পেরিয়ে পঁচাত্তরে পা দিতে চলেছে ভারতের স্বাধীনতা। দেশ জুড়ে হৈ হৈ করে পালিত হবে নানা কর্মসূচি। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই কর্মযজ্ঞে ক্রমশ প্রান্তিক হতে থাকা শ্রমজীবীর অবস্থান কি হবে ? 'অসংগঠিত', 'পরিযায়ী', 'যৌনকর্মী' ইত্যাদি নানা বর্গে ফেলে, মেহনতী মানুষের আসল সত্তাই তো অবলুপ্ত হতে বসেছে। আমরা তো ভুলতে বসেছি আসলে তাঁদের পরিচয় তো একটাই তাঁরা প্রত্যেকেই 'শ্রমজীবী'। অন্যের দয়ায় নয়, বেঁচে থাকেন গতর খাটিয়ে। তাহলে কেন ন্যায্য অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা তাঁরা পাবেন না। ইতিহাস সাক্ষী মেহনতী মানুষের লড়াই বিনা কোনও দেশ পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতার সুফল তাই গুটিকয়েক মানুষ ভোগ করবেন তা হতে পারে না। শ্রমজীবীর অধিকার ও প্রাপ্য মর্যাদা তাঁরা নিজেরাই বুঝে নেবেন। আর এই লড়াইতেই অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাবেন শংকর গুহনিয়োগী ও স্মরজিৎ জানা'র বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড। বুন্দকের নল বা সন্ত্রাসের জু জু দেখিয়ে এই সংগ্রাম থামানো যাবে না। শ্রমজীবীর অধিকার অর্জনের লড়াই চলছে চলবে।

তথ্য সূত্র:

১. দাশগুপ্ত শুভেন্দু, *অধিকার কথা*, নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০০৬।
২. দাশগুপ্ত শুভেন্দু ও জানা স্মরজিৎ (সম্পা.), *অধিকার ভাবনা*, দুর্বার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।
৩. জানা স্মরজিৎ, *সমাজ-সমস্যার সাত সতেরো*, দুর্বার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।
৪. বসু তরুণ, *প্রতিবাদে প্রতিরোধে: জনবিরোধী উন্নয়ন ও দূষণ*, নাগরিক মঞ্চ, কলকাতা, ২০১৫।
৫. জানা স্মরজিৎ, *উন্নয়নের খোঁজে*, দুর্বার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫।
৬. গুণ পুণ্যব্রত, *শংকর গুহনিয়োগীর সঙ্গে কয়েক বছর: এক সহযোদ্ধার প্রতিবেদন*, বুকমার্ক, কলকাতা, ২০১৬।
৭. আচার্য অনিল (সম্পা.), *তিন দশকের গণআন্দোলন*, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮।
৮. চক্রবর্তী রংগন, 'মিছিল চলবে, তিনিও হাঁটবেন' , উত্তর সম্পাদকীয়, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, কলকাতা, ২২ মে ২০২১।
৯. দত্ত প্রদীপ, 'এদেশে গ্রিন পার্টি গড়ার স্বপ্ন দেখতেন স্মরজিৎদা', *চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম: ইন্টারনেটের নতুন কাগজ*, ৪ জুন, ২০২১।
১০. মুখোপাধ্যায় মহাশ্বেতা, 'যৌনকর্মী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষেরা পিতৃহারা হলেন' , *চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম: ইন্টারনেটের নতুন কাগজ*, ৪ জুন, ২০২১।